প্রবন্ধ

শানে রিসালত

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

ইসলাম পূর্ণাঙ্গ দ্বীন কেন

আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন-

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

তরজমা: আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম। আর তোমাদের জন্য 'ইসলাম'কে দ্বীন মনোনীত করলাম। [সূরা: মা-ইদাহ্, আয়াত-৩, কান্‌যুল ঈমান]

এ আয়াত শরীফ বাহ্যত তো 'দ্বীন ইসলাম' পূর্ণাঙ্গ বলে বর্ণনা করছে, কিন্তু সাথে সাথে হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম-এর প্রশংসাও বর্ণনা করছে। এর শানে নুযূল (অবতরণের প্রেক্ষাপট) হচ্ছে- তখন বিদায় হজ্জের বছর ছিলো। অর্থাৎ যখন আল্লাহর মাহবূব আলায়হিস্ সালাম শেষ হজ্জ সম্পন্ন করলেন, তখন জুমুআহর দিন ছিলো, ৯ যিলহজ্জ আসরের পরবর্তী সময় ছিলো। মাহবূব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম উটের উপর আরোহনরত ছিলেন। আর হজ্জের খোৎবা এরশাদ করছিলেন। ঠিক এ সময়ে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

ঘটনাক্রমে ওই দিনে ছয়টি ঈদের সমাবেশ ঘটেছিলো। তিনটি ঈদ মুসলমানদের আর বাকী তিনটি অন্য ধর্মাবলম্বীদের। অর্থাৎ ২৫ ডিসেম্বর 'বড়দিন'ও খ্রিস্টানদের ঈদ।' ওইদিনে ইহুদিদেরও ঈদ ছিলো, মজূসী (অগ্নিপূজারী) সম্প্রদায়েরও ঈদ ছিল। মুসলমানদের জন্য জুমু'আহর দিন ঈদ, হজ্জের দিনও ঈদ, সর্বোপরি মাহবূব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসালাম-এর 'দীদার' বা বরকতময় সাক্ষাৎরূপী ঈদও ছিলো সেদিন। মোট কথা এসব ঈদের কারণে, ওই দিন সমগ্র দুনিয়ায় ঈদই ঈদ ছিল অর্থাৎ খুশীর উপর খুশীই বিরাজ করছিলো। এতগুলো ঈদ কোন দিনে এ পর্যন্ত আর কখনো একত্রিত হয়নি।

[তাফসীর-ই রূহুল বয়ান]

এ আয়াত শরীফ থেকে কয়েকটি বিষয় প্রতীয়মান হয়:

এক. এ পর্যন্ত সকল ধর্ম, যেমন হযরত মূসা ও হযরত ঈসা আলায়হিমাস্ সালাম-এর ধর্ম ইত্যাদি, অসম্পূর্ণ ছিলো। সাময়িকভাবে এগুলোকে প্রবর্তন করা হয়েছিলো। এরপর 'মানসূখ' বা রহিত করা' হয়েছে; কিন্তু দ্বীন ইসলাম এমন পূর্ণাঙ্গ যে, সেটার মধ্যে না কেউ কমবেশী করতে পারে, না কেউ এ ধর্মগ্রন্থ ক্বোরআন শরীফকে পরিবর্তিত করতে পারে, না কেউ নতুন কোন নবী হয়ে আসতে পারে, না কখনো এ দ্বীন মান্‌সুখ বা রহিত হবে। যেমনিভাবে ডাক্তার (চিকিৎসক) তাঁর দুর্বল রোগীকে প্রাথমিক পর্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন ওষুধ ও পথ্য (খাদ্য) বদলে দিয়ে থাকেন, তারপর যখন রোগীর মধ্যে পূর্ণ শক্তি এসে যায়, তখন তাকে চূড়ান্ত খাদ্য আহার করতে দেন। অথবা এভাবে বলা যায়- শিশুকে জন্মের সাথে সাথে মধু, শালদুধ (মায়ের বুকের দুধ) ইত্যাদি সাময়িকভাবে খাওয়ানো হয়, তারপর শিশু শক্তিশালী হলে ভাত-রুটি ইত্যাদি দেওয়া হয়, তেমনি এ দ্বীনের বিষয়াদিও। (অর্থাৎ বিদায় হজ্জের দিন দ্বীনের পরিপর্ণূতা ঘোষণা করা হয়েছিলো, ফলে ক্বিয়ামত পর্যন্ত এ দ্বীন বলবৎ ও কার্যকর থাকবে।)

দুই. ইসলাম সমস্ত ধর্মের চেয়ে বেশী পরিপূর্ণ। আর ইসলামের মহান প্রবতর্ক আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামও অন্য ধর্মের প্রবর্তক অপেক্ষা অধিক শ্রেষ্ঠ, অধিক পরিপূর্ণ। কেননা, 'কামিল' বা পরিপূর্ণ সত্তার হাতে প্রদত্ত প্রতিটি বস্তুই পূর্ণাঙ্গ হয়। মাদরাসা বা স্কুল ইত্যাদির ছাত্ররা নিম্নতর শ্রেণীগুলোতে ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষকের নিকট পড়ে উন্নতি করতে থাকে, ঊর্ধ্বতন ক্লাশগুলোতে উত্তীর্ণ হতে থাকে। কিন্তু সর্বোচ্চ 'সনদ' (সার্টিফিকেট) নিয়ে পরিপূর্ণ তখনই হয়, যখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ পদের (কিংবা প্রতিষ্ঠানের সর্বাধিক জ্ঞানী) ওস্তাদের নিকট শিক্ষালাভ করে থাকে। সুতরাং ওই ছাত্রদেরকে 'কামিল' (পরিপূর্ণ) করেন এবং তাদের শিক্ষাকে পূর্ণতা দান করেন- 'কামিল' বা পরিপূর্ণ শিক্ষকই।

তিন. ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা ব্যতিরেকে এবং ইসলামের মহান প্রবর্তকের গোলামী করা ছাড়া কোন আমল (কর্ম) কোন নেকী (সৎকর্ম) আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে কবুল হয় না; বরং সবই প্রত্যাখ্যাত হয়। কেননা, 'কুফর' হচ্ছে এক প্রকার বিষ। যদি কোন খাদ্যে বিষ পতিত হয়, তারপর যদি তাতে উন্নতমানের মসল্লাও দেওয়া হয়, তাহলে ওই খাদ্য যে-ই খাবে, সে অবশ্যই মারা যাবে। যে গাছের শিখড় কেটে যায়, তার শাখা ও পাতায় যদি উত্তম পানি এমনকি দুধ ঢালা হয়, তবে সেটার জন্য এসবই অকেজো। অনুরূপ, যদি হুযূর-ই আকরাম আলায়হিস্

সালাতু ওয়াস্ সালাম-এর গোলামী করা ব্যতীত যা কিছু (কর্ম) করা হয়, তার সবই বেকার (অকেজো)। পংক্তি

پندار سعدی کہ راہ صفا۔ تواں رفت جز در پئے مصطفے

অর্থাৎ হে সাদী! এটা মনে করো না যে, হযরত মুহাম্মদ মোস্তফার পদাংক অনুসরণ করা ব্যতীত স্বচ্ছ- পবিত্র পথে চলতে পারবে। (অর্থাৎ সম্ভব নয়।)

চার. 'দ্বীন'কে 'কামিল' (পরিপূর্ণ) করা হয়েছে আর 'নি'মাত'কে করেছেন 'তামাম' (পূর্ণাঙ্গ)। আরবী ভাষায় কামিল (كامل) হচ্ছে ওই বস্তু, যার মধ্যে আর কমবেশী করা যায় না। সুতরাং ইসলামের 'উসূল' (মূলনীতিগুলো)-তে এখন না বেশী করা যাবে, না কম। (এতে এখন কোনরূপ বৃদ্ধি বা হ্রাস করা যাবে না।) আর 'তামাম' (تمام) বলা হয় তাকে, যাতে বৃদ্ধি তো করা যায়, কিন্তু কম বা হ্রাস করা যায় না। সুতরাং আয়াত শরীফে উল্লিখিত اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ (আমি তোমাদের উপর আমার নি'মাতকে 'তামাম' বা পরিপূর্ণ করেছি)-এর মধ্যে 'নি'মাত' মানে হয়তো শরীয়তের মাস্আলা-মাসাইল অথবা বিজয়াদি। সুতরাং এ দু'টি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া সম্ভব। (সুতরাং ইসলামী শরীয়ত যেমন নতুন নতুন যত সমস্যা হবে, সব সমস্যার সমাধান দিতে সক্ষম, তেমনি ইসলাম ও মুসলমানদের বিজয়গুলো অব্যাহত থাকাও সম্ভব।)

পাঁচ. যখন আল্লাহ্ তা'আলা ইসলামের উপর সন্তুষ্ট, তখন তো ইসলামের মহান প্রবর্তকের উপর আরো বেশী সন্তুষ্ট। অনুরূপ, তিনি মুসলমানদের উপরও সন্তুষ্ট। আল্লাহ্ তা'আলা ইসলামের উপর কায়েম রাখুন! আ-মী-ন।

হুযূর-ই আকরাম নিজেও নূর, তিনি সবাইকেও আলোকিত করেন

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন-

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُوْرٌ وَكِتَابٌ مُّبِيْنَ

তরজমা: নিশ্চয় তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা নূর এসেছে এবং স্পষ্ট কিতাব।

[সূরা মা-ইদাহ্: আয়াত ১৫, কানযুল ঈমান]

এ আয়াত শরীফ হুযূর-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর উচ্চাঙ্গের প্রশংসা। এতে কিতাবী সম্প্রদায়কে সম্বোধন করে এরশাদ হয়েছে- 'হে আল্লাহর বান্দাগণ, তোমাদের নিকট বড় শানদার নূর এবং সুস্পষ্ট কিতাব এসে পৌঁছেছে। এ আয়াতে হুযূর আকরামকে 'নূর' বলেছেন। 'নূর' হচ্ছে তাই, যা নিজেতো প্রকাশ্য, অন্যদেরকেও প্রকাশ করে। দেখুন, সূর্য 'নূর'। সূর্যকে দেখার জন্য অন্য কোন আলোর দরকার হয় না, কেননা সেটা নিজে আলোকিত এবং যার উপর সেটার আলো পড়েছে সেটাও আলোকিত হয়ে গেছে।

দুনিয়ায় কেউ নিজের বংশ পরিচয় দিয়ে প্রসিদ্ধ হয়, কেউ পেশার কারণে, আর কেউ রাজত্বের কারণে খ্যাতিমান হয়। কিন্তু হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম অন্য কারো কারণে প্রসিদ্ধ হননি। তিনি নিজেই নূর (জ্যোতি), তাঁকে কে চমকাবে? বরং তাঁর কারণে ও মাধ্যমে সবাই চমকিত ও প্রসিদ্ধ হয়েছে। এ কারণে, কোন বাদশাহর বংশে তাঁর বেলাদত (জন্ম) শরীফ হয়নি, কোন বড় ধনীর ঘরেও তিনি আবির্ভূত হননি; বরং তাঁর বেলাদত শরীফের পূর্বে তার উপর থেকে পিতার ছায়া তুলে নেওয়া হয়েছে, নবূয়ত প্রকাশের পূর্বে প্রায় সব আত্মীয়-স্বজন আগে-পরে দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছেন। নবূয়ত প্রকাশের পর যারা জীবদ্দশায় ছিলো তারা তো তাঁর পবিত্র রক্তের পিপাসু ছিলো। এসব এ জন্য ছিলো যেন কেউ একথা বলতে না পারে যে, হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম-এর প্রসিদ্ধি তাঁর বংশ কিংবা নিকটাত্মীয়দের কারণে হয়েছে।

মোটকথা, এমন সঙ্গহীন অবস্থা ছিলো, অথচ সমগ্র দুনিয়া তাকে চিনে। কেমন চিনে? বেলাদত (জন্ম) শরীফের পূর্বে চতুর্দিক খবর ছড়িয়ে পড়েছে যে, সর্বশেষ নবীর যমানা নিকটবর্তী হয়ে এসেছে। ফলে, বন্ধুদের মধ্যে খুশীর রব, আর শত্রুদের মধ্যে দুশ্চিন্তা ছেয়ে গেলো, যেমনিভাবে সূর্য উদিত হবার পূর্বে আসমানে আলো ব্যাপকভাবে উদ্ভাসিত হয়। আর প্যাচাঁ অস্বস্থি বোধ করে। শৈশব কালে শুধু সকল মানুষ নয়, বরং পশু এবং পাথরও তাঁকে চিনতো যে, ইনি শেষ যমানার নবী। হযরত হালীমা সা'দিয়া হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামকে নিয়ে নিজের ঘরের দিকে রওনা হলেন। তখন তাঁর বাহন (উট) বলে উঠলো, "হে হালীমা! আমার পিঠের উপর শেষ যমানার নবী তাশরীফ রেখেছেন। [সূত্র: মাদারিজুন্নুবূয়ত]

আর হুযূর আক্রামের নূরানিয়াতের এমন অবস্থা যে, তাঁকে যমীন জানে, আসমান চিনে, যমীনবাসী তাঁর সম্পর্কে জানে ও চিনে, আরশবাসীগণ তার খিদমত করেছেন, তাঁর ইঙ্গিতে ডুবে গেছে এমন সূর্য ফিরে এসেছে, চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়েছে। কারণ, এগুলো জানে যে, এ ঈঙ্গিত আর কারো নয়, হুযূর-ই আক্রামেরই।

তাঁর ওফাত শরীফের পর আজ চৌদ্দশ' বছরের বেশী সময়কাল অতিবাহিত হয়েছে, কিন্তু পৃথিবীর প্রতিটি কোণায় ও প্রান্তে, দুনিয়ার প্রতিটি রাজ্যে তাঁর নাম, তাঁর সমস্ত কর্ম শরীফ, তাঁর পবিত্র জীবদ্দশার প্রতিটি বরকতময় অবস্থা দুনিয়াবাসীদের সামনে স্পষ্ট। এত দীর্ঘ কালে দুনিয়ার অনেক প্রেমাস্পদ, অনেক রাজা-বাদশাহ্, অনেক জ্ঞানী-গুণী গত হয়েছেন, কিন্তু অনেকের নাম পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকেনি। আ'লা হযরত বলেন-

کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے - پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی (صلی اللہ علیہ وسلم)

অর্থ: এ খবর আছে কি? এ পর্যন্ত আকাশে কত তারাকা উদিত হয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে, কিন্তু না অস্তমিত হবেন, না ডুবেছেন- আমাদের নবীরূপী উজ্জ্বল নক্ষত্র (সূর্য)। তাঁর উপর আল্লাহর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক।

এ'তো হলো হুযূর-ই আকরামের প্রকাশ ও প্রসিদ্ধির আলোচনা। এখন দেখুন তাঁর বরকতে অন্য সৃষ্টি কিভাবে আলোকিত হয়েছে। সংক্ষেপে এতটুকু আরয করা হচ্ছে যে, দুনিয়ায় বড় বড় সন্তানধারী, সম্পদশালী এবং বাদশাহীর মুকুটধারীরা গত হয়েছেন, আর তাঁরা তাঁদের নাম ও খ্যাতিকে ধরে রাখার জন্য অনেক চেষ্টা-তদবীরও করেছেন। কেউ কেউ অট্টালিকা (দালান-কোটা) নির্মাণ করে গেছেন যেমন- তাজমহল ইত্যাদি, কেউ কেউ কোন কিতাব রচনা করেছেন, মোটকথা, নিজ নিজ নামের চর্চার জন্য অনেক চেষ্টা-তদবীর করেছেন, কিন্তু নাম বেশী দিন থাকেনি। আর হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম-এর সম্মানিত মাতা-পিতা, হযরত আমেনা খাতুন ও হযরত আবদুল্লাহ্, খাজা আবদুল মুত্তালিব ও হাশিম প্রমুখ, অনুরূপ হুযূর-ই আক্রাম (আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম)-এর লালন-পালনের খিদমত আঞ্জাম দাতাগণ, যেমন হযরত হালীমা ধাত্রী- প্রমুখ, সমগ্র দুনিয়া ক্বিয়ামত পর্যন্তের জন্য প্রসিদ্ধ হয়ে গেছেন। এটা কেন? শুধু এজন্য যে, হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম-এর মহান সত্তার সাথে তাঁদের সম্পর্ক কায়েম হয়ে গেছে। মোটকথা, তিনি নিজের বংশ-খান্দানকে আলোকিত করেছেন, নিজের দেশকে আলোকিত করেছেন। তিনি যেখানে নিজের কদম শরীফ রেখেছেন, সেটা বিশ্ববাসীদের জন্য যিয়ারতস্থল হয়ে গেছে। যদি আরবে তাঁর বরকত মণ্ডিত আবির্ভাব না হতো, তবে আজ কা'বা শরীফকে কে চিনতো? মদীনা শরীফকে মানতো? দেখুন, এ দেশে না কোন রং-তামাশার স্থান আছে, না কাশ্মির ও পেরিসের মতো বিনোদনের জায়গা ও ব্যবস্থা আছে, না আছে সবুজ ভূ-খণ্ড, না ফলমূলের বাগান। কিন্তু সমস্ত দুনিয়া সেদিকে আকৃষ্ট হচ্ছে। এমনটি কেন? তা এজন্য যে, আরবের বাগানে, হযরত ইব্রাহীম খলীল আলায়হিস্ সালাম-এর কাননে এমন এক ফুল ফুঠেছে, যার সুবাসে সমগ্র দুনিয়া সুবাশিত হয়ে গেছে। ওই পুষ্প মদীনা মুনাওয়ারার কেয়ারীতে ফুটেছে। সেটার আকর্ষণে সবাই ওই দিকে ছুটছে। মোটকথা, যমীন ও আসমানে চাক্কি (পেষনযন্ত্র) সবাইকে পিষে ফেলে, কিন্তু যে বস্তুটি বিশ্বের কেন্দ্রস্থলের সাথে মিশে যায়, যা ওই চাক্কিতে নিষ্পেষিত হতে পারে না, বরং বেঁচে যায়। কবি বলেন-

چکی کے پاٹن دیکھ کر اور دیا کبیر اروئے - جو پاٹن میں اگیا سو ان میں بچا نہ کوئے
چکی چکی سب کہیں اور کیلی کہے نہ کوئے - جو کیلی سے لاگا اس کا بال نہ بیکا ہوئے

এ'তো বন্ধুদের আলোচনা ছিলো। যারা শত্রুতা করেছে তারাও খ্যাত (কুখ্যাত) হয়ে গেছে। যেমন আবূ জাহল প্রমুখ।

এতো 'নূর'-এর অর্থের বিশ্লেষণ ছিলো। এখন আরো দু'টি কথা গভীরভাবে দেখার বিষয় রয়েছেঃ

এক. 'নূর'কে 'কিতাব' (ক্বোরআন)-এর সাথে কেন উল্লেখ করা হয়েছে? এর কারণ হচ্ছে- কোন কিতাবই অন্ধকারে পড়া যায় না; আলোর দরকার হয়। অনুরূপ, আল্লাহর কিতাবের মর্মার্থ সেই জানতে ও বুঝতে পারে, যার অন্তরে আল্লাহর ওই নূর উদ্ভাসিত থাকে। যখন ওই নূর অন্তরে স্থান পায়, তখনই ক্বোরআন হাতে আসে। কবির ভাষায়-

وہ جس کو ملے ایمان ملا ایمان تو کیا رحمت ملا
قرآن بھی جب ہی ہاتھ آیا جب دل نے وہ نور ہدی پایا

অর্থাৎ- তাঁকে (রসূলে করীমকে) যে পেয়েছে সে ঈমান পেয়েছে। শুধু ঈমান কেন? পরম করুণাময়কে পেয়ে গেছে। ক্বোরআনও যখন হস্তগত হয়েছে, তখন ওদিকে হৃদয় ও হিদায়তের আলো পেয়ে গেছে।

দুই. نُوْرٌ -এর তান্‌ভীর (দু'পেশ) মহত্ব বুঝানোর জন্য এসেছে। অর্থাৎ 'বড় নূর' এসেছে। হুযূর-ই আকরাম বড় নূর হওয়াও কয়েক কারণেঃ যেমন **প্রথমত**, সূর্যের আলো দুনিয়াতে ক্রমশ বেশী হতেই থাকে। যেমন ভোর বেলায় থাকে মৃদু, দুপুরে এর তাপ বৃদ্ধি পায়। বিকেলে ও সন্ধ্যায়

থাকে কম আর রাতে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত; কিন্তু রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নূর (জ্যোতি) কখনো হ্রাস পায় না। আবার সূর্য সব সময় পৃথিবীর অর্ধেকাংশকে আলো দেয়। কিন্তু আল্লাহর হাবীবের নূর সমগ্র পৃথিবীকে, বরং ফরশ এবং আরশকেও আলোকিত করে। সূর্য দেহের বাহ্যিক দিককে চমকায়, আল্লাহর হাবীবের নূর হৃদয়কে, সমাজকে ও মন-মানসিকতাকে পর্যন্ত আলোকিত করে। মোটকথা সব কিছুকে চমকায়। যে ব্যক্তি সূর্যের রোদ থেকে বাঁচার জন্য ঘরের নিম্নাংশের কুঠরীতে আশ্রয় নেয় রোদ থেকে বেঁচে যেতে পারে সে কিন্তু নূর-ই মুহাম্মদ নিম্নঃ কুঠরীতে, পাহাড়ের চূড়ায়, এমনকি যেখানে খোদার খোদায়ী বিরাজমান সেখানে পৌঁছে যায়, কাউকে বঞ্চিত করে না। যে ব্যক্তি তাঁর আলো গ্রহণ করে উপকৃত হতে চায় না সে তো হতভাগা বৈ কিছুই নয়। হুযূর-ই আকরামের বেলাদত (জন্ম) মক্কা মুকার্‌রামায় হয়েছে। মক্কা শরীফ পৃথিবীর মধ্যভাগে (কেন্দ্রভূমি) অবস্থিত। কেননা, মাহফিলের এক পাশে জ্বালানো লাইট ওই পাশে বা বিশেষ বিশেষ অংশকে আলো দেয়, কিন্তু মধ্যভাগে প্রখরভাবে জ্বালানো লাইট গোটা মাহফিলকে আলোকিত করে দেয়। অনুরূপ অন্যান্য নবীগণ বিশেষ প্রান্তগুলোতে জ্বালানো লাইট স্বরূপ, যাঁরা বিশেষ বিশেষ দলকে হিদায়ত প্রদান করেছেন। কিন্তু হুযূর-ই আকরাম আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম হলেন সমগ্র খোদায়ীর জন্য সমুজ্জ্বল আলো। সুতরাং তিনি সমগ্র দুনিয়ার ঠিক মধ্যখানে শুভাগমন করেছেন। এজন্য এরশাদ হয়েছে-

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّي رَسُوْلُ اللهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا

অর্থাৎ হে মানবকুল, আমি তোমাদের সবার প্রতি রসূল। হযরত ইয়ূসুফ মিশরে গিয়ে চমকিত হয়েছেন, জজ সাহেব কাছারীতে গিয়ে, মাওলানা- মৌলভী মাদরাসায়, স্টেশন মাস্টার স্টেশনে গিয়ে চমকান, কিন্তু হুযূর-ই আলায়হিস্ সালাম সব সময় সর্বত্র চমকিত হয়েছেন। তাঁর মুদ্রা আরশ, ফরশ ও সব বাজারে সচল। মহান রব এ আয়াতে হুযূর আকরামকে 'নূর' বলেছেন, আর ক্বোরআনকে বলেছেন- 'মুবীন' অর্থাৎ আলোকিতকারী, প্রকাশকারী। 'নূর' ও 'মুবীন'-এর মধ্যে পার্থক্য কী? 'নূর' তো চোখে দেখা যায়, বরং অন্ধও কিছু না কিছু আঁচ করতে পারে। এ অর্থের ভিত্তিতেও হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম 'নূর' অন্ধ আবূ জাহল প্রমুখও তাঁকে চিনতো। এরশাদ হয়েছে- يَعْرِفُوْنَهُ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَاءَكُمْ (তারা তাঁকে চিনে, যেভাবে তারা তাদের পুত্রদেরকে চিনে।) কিন্তু ক্বোরআন-ই করীমকে তারাই চিনতে পেরেছে, যারা ঈমান এনেছে। আর তা থেকে মাসআলা-মাসাইল তিনিই বের করতে পারেন। যিনি জ্ঞান ও ইজতিহাদের যোগ্যতা রাখেন। ক্বোরআনকে পাওয়া সবার ভাগ্যে জুটে না। পবিত্র ক্বোরআন এরশাদ করছে-

فَاِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُوْنَكَ وَلٰكِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بِاٰيٰتِ اللهِ يَجْحَدُوْنَ-

অর্থাৎ হে মাহবূব! এ কাফিরগণ আপনার প্রতি মিথ্যারোপ করে না, বরং আল্লাহর আয়াতগুলোকে অস্বীকার করছে। বুঝা গেলো যে, কাফিরগণও মাহবূব আলায়হিস্ সালামকে আল-আমীন (আমানতদার) সত্যবাদী, সৎ ও সরল বলে জানতো; অবশ্য ক্বোরআনকে জানতো না। এ-ই হলো 'নূর' ও 'মুবীন' এর মধ্যকার পার্থক্য।

অথবা একথা বুঝে নিন- ক্বোরআনকে চমকিয়েছেন হুযূর-ই আকরাম; কেননা, তিনি নূর। আর ক্বোরআন হুযূর-ই আকরামের গুণাবলী বিভিন্ন স্থানে বর্ণনা করেছে। কেননা ক্বোরআন হলো বর্ণনাকারী, প্রকাশকারী (মুবীন)। সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া-লিহী ওয়া আসহা-বিহী ওয়া বা-রাকা ওয়াসাল্লাম ওয়য়াসাল্লাম।